সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 52 | No. 1 | 2014

Check for updates

প্রকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব

Volume	52
Issue	1
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আফজালুল বাসার
Published online	October 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v52i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i1.2
Pages	৫৯-৮৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

প্রকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব

Check for updates

আফজালুল বাসার*

প্রতীচ্য সাহিত্যতত্ত্বে প্রকরণবাদ (Formalism) বলতে প্রধানত রুশ প্রকরণবাদকেই বোঝায়। এই তত্ত্বের লক্ষ্য ছিল সাহিত্যের পঠন-পাঠনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর দাঁড় করানো এবং স্বকীয় শৃঙ্খলায় কাঠামোবদ্ধ করা। এলিয়টের চিন্তায় ছিল যে 'কবির নিকট থেকে কবিতার দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনা' সেটি প্রকরণবাদে অবলম্বিত হয়। এর আগে উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রাধান্য লাভ করেছিল প্রত্যক্ষবাদী সাহিত্যচিন্তা, যেখানে বিবেচ্য হত সাহিত্যকর্মের উৎস ও সৃষ্টির ইতিহাস। গুরুত্ব পেত জীবনীর বর্ণনা, কবির ধারণার তথ্য ইত্যাদি। এর ফলে সাহিত্য-সমালোচনায় সাহিত্যগুণ ক্ষুণ্ন হতে থাকে। সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা হয়ে ওঠেন 'মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, দর্শনের মধ্যে সীমিত রীতিনীতি ভিত্তিক' সাহিত্যের উপস্থাপক মাত্র। এরই বিপরীতে প্রকরণবাদীরা সাহিত্যের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হন। ১৯১৪ সনে রুশ লেখক ভিক্টর শক্লোভস্কি ভবিষ্যৎবাদী ইশতেহার প্রকাশ করেন — 'The Resurrection of the Word' প্রবন্ধ যা রুশ প্রকরণবাদের সূচনা ঘটায়। অবশ্য এই সূচনা ও এর বিকাশের ধারাটি ১৯৩০ সনে সমাপ্ত হয়ে যায় যখন ট্রটস্কি তাঁর *Literature and Revolution* গ্রন্থে প্রকরণবাদকে সমালোচনা করে একটি অধ্যায় রচনা করেন।

বস্তুত দুটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর আলাপ-আলোচনা, সভাসমিতি ও রচনাকর্ম থেকে এই তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। পিটার্সবার্গ ভিত্তিক 'অপোইয়াজ চক্র' (Opoyaj) এবং 'মস্কো ভাষাতাত্ত্বিক কেন্দ্র' (Moscow Linguistic Circle) — এই কেন্দ্রদুটির তাত্ত্বিকেরা প্রকরণবাদকে সাহিত্যগুণসম্পন্নতা ও কাব্যিক-ভাষা সন্ধানের অভিমুখিতা দেন। এই তত্ত্বের সময়ক্রম হচ্ছে নিম্নরূপ :

১৯১৪ : ভিক্টর শক্লোভস্কির ভবিষ্যৎবাদী ইশতেহার-খ্যাত প্রবন্ধ 'The Resurrection of the Word' প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রকরণবাদের সূচনা।

১৯১৫ : মস্কোয় 'মস্কো ভাষাতাত্ত্বিক কেন্দ্র' ১৯১৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২৪ সনে বিলুপ্ত হয়। এর সদস্য ছিলেন ফিলিফ ফেদ্রোভিচ ফরচুনেভ (প্রতিষ্ঠাতা), রামান ইয়াকবসন, গ্রিগরি ভিনোকুর, বরিস তোমাশেভস্কি, পিটার বোগাতিরেভ।

১৯১৬ : সেন্ট পিটাসবার্গে 'অপোইয়াজ চক্র' ১৯১৬ সনে 'মস্কো ভাষাতাত্ত্বিক কেন্দ্র'-এর কাউন্টারপার্ট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সক্রিয় ছিল ১৯৩০ সন পর্যন্ত। সদস্য ছিলেন ভিক্টর শক্লভস্কি, বরিস আইকেনবম এবং ওসিপ ব্রিক প্রমুখ।

১৯২০ : রামান ইয়াকবসনের মস্কো ত্যাগ করে চেকোশ্লোভাকিয়ায় গমন।

১৯২৪ : ট্রটস্কির *Literature and Revolution* গ্রন্থ প্রকাশ, যেখানে রুশ প্রকরণবাদকে সমালোচনা করা হয়।

---

* লেখক ও গবেষক।

১৯২৮ : রামান ইয়াকবসন কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রাগের ডারবি কাফেতে ১৯২৮ সনে 'প্রাগ ভাষাতাত্ত্বিক কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রুশ প্রকরবণবাদের প্রসারলাভ। ১৯৩৯ সন পর্যন্ত কেন্দ্রটি চালু ছিল। সদস্য ছিলেন রামান ইয়াকবসন, পিটার বোগাতিরেভ প্রমুখ।

১৯৩০ : 'The Resurrection of the Word' প্রবন্ধটি রাজনৈতিক চাপের মুখে প্রত্যাহার।

১৯৩৯ : রাজনৈতিক চাপের মুখে 'প্রাগ ভাষাতাত্ত্বিক কেন্দ্র' বিলুপ্ত।

রুশ প্রকরণবাদ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করল কোনো রচনা কীভাবে সাহিত্য হয়ে ওঠে, এ বিষয়টির তত্ত্বীয় পরিকাঠামো হল 'সাহিত্যগুণ' (artfulness) শব্দটি। কীভাবে এই সাহিত্যগুণ সৃষ্টি হয়? সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণের সূত্রেই এটির উদ্ভব ঘটে এবং অপরিচিতিকরণ (defamiliarization) দ্বারা ওই সাহিত্যগুণ সৃষ্টি হয়। শক্লোভস্কির মতে, এটি শিল্পে এমন ধারণা যুক্ত করে যা জীবন ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে নতুনরূপে সঞ্জীবিত করে। অভ্যস্ত এবং স্বতঃক্রিয় বিষয়গুলোকে অপরিচিত করে দেয়, যেমন করে প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের হাঁটাহাঁটি নৃত্যের মধ্যে বদলে যায়। নৃত্যের মধ্যে স্বতঃক্রিয় হাঁটার ভঙ্গিগুলোই নতুন হয়ে ধরা পড়ে। কবিতার ক্ষেত্রে সাধারণ ও ব্যবহারিক ভাষাই শিল্পের আঙ্গিকে অপরিচিত হয়ে তির্যক, কঠিন, তীক্ষ্ণ, জটিল রূপ পায়। প্রতিদিনের ভাষা কবিতায় হয়ে ওঠে অপরিচিত। শক্লোভস্কির মতে, "কাব্যিক ভাষা হল অপরিচিতিকরণ"। তবে ভাষা কবিতার কলাপ্রকরণে প্রযুক্ত হলেই এটা ঘটবে, যেমন কবিতার অন্ত্যমিল, ছন্দোস্পন্দ ইত্যাদি। যা পরিচিত তা আমাদের কাছে একঘেয়ে ও নিষ্ক্রিয় উপস্থিত নিয়ে ধরা দেয়। এটা হল অনুভূতির সাধারণ সূত্র যাকে বলা হয় প্রত্যক্ষণ। একটি কাজ প্রথমবার করার অনুভূতি আর দশ হাজারবার করার অনুভূতি এক নয়। অভ্যস্ত হবার কারণে আমরা প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের একটি অংশ ব্যবহার করে পুরো বিষয়টিকে প্রকাশ করতে পারি। যেমন, বীজগণিতের a, b, c ইত্যাদি। এগুলো প্রতীকী ভাষা। পুরো বস্তুকে না দেখে অংশ বা প্রধান প্রবণতা দেখে পুরো বস্তুকে বোঝানো হয়। বস্তুটা যেমন বস্তাবন্দি, আমরা বস্তাটাকে দেখি। কাজেই আমাদের এই দেখা বাইরের আকারকে দেখা। ফলে এক সময় প্রকৃত আকারকে ভুলে যাই। শক্লোভস্কির মতে,

> The object perceived thus in the manner of prose perception, fades and does not leave even a first impression, ultimately even the essence of what it was is forgotten. (Art as Technique, 1965)

তাঁর বক্তব্য হচ্ছে কোনো কিছু করতে করতে তা করছি কিনা সে বিষয়ে সচেতন না হয়ে করা আর তা ভুলে গিয়ে করা যেন এই ব্যাপার, 'And so life is reckoned as nothing', কাজেই 'Habitualization devours works, clothes, furniture, one's wife and the fear of war', এই যে জীবন, যা আছে কিন্তু যাকে মনে হচ্ছে নেই, এই জীবনের ক্লিশে অনুভূতিকে জাগিয়ে দেয় সাহিত্য। সাহিত্য সুযোগ করে দেয় কোনো কিছুকে অনুভূত হওয়ার, পাথরকে বানিয়ে দেয় পাথুরে। এই ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা মিলে যায়। তাঁর মতে, সমাজ-কল আর সময়-কল অর্থাৎ বেদনাবোধ জাগিয়ে দেয়; আমাদের ভেতরের আমিকে সজীব করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ রুশ

প্রকরণবাদ সম্পর্কে সরাসরি অবহিত ছিলেন কিনা তা গবেষণার বিষয়, কিন্তু তাঁর ভাবনা ও এই তাত্ত্বিকদের চিন্তার মধ্যে এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই।

কাজেই শিল্পের কাজ হল পরিচিত বিষয়টিকে অপরিচিতির মাধ্যমে অনুভূত হবার অবস্থা তৈরি করা। অপরিচিতিকরণের মধ্য দিয়ে প্রকরণ অন্যবস্তু এবং জটিল রূপ তৈরি করে। ফলে পরিচিত বিষয়বস্তু সাহিত্যগুণরূপে উপলব্ধ হয়। শক্লোভস্কির বক্তব্য :

> The purpose of art is to import the sensation of things as they are perceived and not as they are known. The technique of art is to make objects 'unfamiliar' to make forms difficult, to increase the difficulty and length of perception is an aesthetic end in itself and must be prolonged. Art is a way of experiencing the artfulness of an object; the object is not important. (তদেব)

কিন্তু এই অপরিচিতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কেননা অপরিচিত জিনিস একসময় পরিচিত হয়ে যায়, তখন তা আর অর্থবহ থাকে না। অভ্যস্ত অনুভূতি, পরিচিত ভাষা, একঘেয়ে শব্দবন্ধ ইত্যাদি কীভাবে নতুনরূপে প্রতীয়মান হবে সে প্রশ্ন দেখা দেয়। এই প্রশ্নের উত্তরে তাত্ত্বিকেরা ব্যাখ্যা করেন কলা-প্রকরণকে — কীভাবে অনুভূতিকে বিঘ্নিত করে দেয়া হয়, দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম করে তোলা যায়, এক কৃত্রিম ধাক্কার ব্যবস্থা করে যার পরিণতিতে বিষয়টিকে মনে হয় নতুন। তখনই বস্তুর সাহিত্যগুণ উপলব্ধি করা যায়। আবার ভালোবাসাকে নতুন মনে হয়, অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে জীবন। এভাবেই বাগানের গোলাপ হয়ে ওঠে রিলকের প্রিয় গোলাপ।

শক্লোভস্কির 'The Resurrection of the Word' রচনাটি পাঠে আমরা এই শব্দের ধাক্কা, নতুনত্ব, পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি সাহিত্যগুণ পাই। শব্দকে নতুন ব্যঞ্জনায় ভরিয়ে তোলাই হল শব্দের পুনরুজ্জীবন। ব্যঞ্জনা সৃষ্টির কাজ হল তাই যার মাধ্যমে শব্দ নতুন রূপে-রসে-গন্ধে-বর্ণে অনিবার্য হয়ে ওঠে, জীবন্ত হয়ে ওঠে। তারপর আবার অভ্যস্ত হতে হতে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে এক সময় তার মৃত্যু ঘটে। কবিতার ভাষা থেকে তা চ্যুত হয়ে গদ্যে পর্যবসিত হয়। কবি তখন সেই ভাষাকে ভিন্ন ব্যঞ্জনা দানের মধ্য দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করেন। এইভাবে কাব্য থেকে গদ্যে এবং গদ্য থেকে কাব্যে এই চক্রায়ন অব্যাহত থাকে।

কিন্তু একসময় ব্যঞ্জনাও স্থায়িত্ব হারিয়ে ফেলে; তখন প্রয়োজন হয় নবব্যঞ্জনার। নইলে পরিচিত হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা তা শুধু চিহ্নিত করতে পারি, সে শব্দভাষা নিয়ে আমাদের সাড়া প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। শুধু শব্দ বা ব্যঞ্জনা নয়, পুরো বিষয়টাই শবদেহে রূপান্তরিত হয়ে সাহিত্যশবে পরিণত হতে পারে। এ-সূত্রে শক্লোভস্কি জনগণের রুচি ও বাজারি বিবেচনাকে দেখেন সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উপায় হিসাবে। এর বিপরীতে বলা যায়, জনগণ ও বাজারের রয়েছে ব্যাপক সৃষ্টিশীলতা, এমনকি যখন অন্য সবকিছু থেমে যায় তখনো জনগণ ও বাজার সক্রিয়তায় চলমান থাকে। জনগণ ও বাজারের ব্যঞ্জনা অন্তহীন। আমরা জানি জনগণের প্রভূত সৃষ্টিশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা আছে। বায়ান্ন ও একাত্তর সালে বাঙালি জনগণই সৃষ্টিশীলতা প্রমাণ করে বাস্তবতা ও ভাষাকে দিয়েছেন নবজন্ম যা অজস্র সাহিত্য সৃষ্টির উৎস-উপাদানে পরিণত হয়েছে, এখনো হচ্ছে।

শক্লোভস্কি এইভাবে ভাষাগত ব্যঞ্জনা পুনরুজ্জীবনের পন্থা বাতলে দিয়ে বলতে চাইছেন যে এ পথেই শিল্পীরা চলবে, তাত্ত্বিকেরা নন।

বিশ শতকের কোনো সাহিত্যতত্ত্বে সাহিত্যগুণকে যদি সর্বোচ্চ মূল্য প্রদান করা হয়ে থাকে তবে তা দেয়া হয়েছে এই রুশ প্রকরণবাদে, অন্য কোনো সাহিত্যতত্ত্বে নয়। এবং এই তত্ত্ব পরবর্তী সকল সাহিত্য-সমালোচনায় প্রভাব বিস্তার করেছে, বিশেষত ভাষাভিত্তিক ও অবয়ববাদী সমালোচনাতত্ত্বে।

দুই

ইয়াকবসনের মতে, ওই সাহিত্যগুণ কোনো সাহিত্যের অভ্যন্তরীণ ভাবগত গুণ নয় তা শব্দ ব্যবহারের এবং প্রকরণের বিশেষবাদী বা বৈপরীত্যবাদী গুণ। প্রকরণ, বিপরীত প্রকরণ এবং বিশেষ পৃথক প্রকরণ এই হল সাহিত্যগুণের মূলকথা। এর মধ্যে কোনো নীতিগর্ভতা নেই, ঐকান্তিকতা নেই। এমনকি নেই কবির ব্যক্তিগত গুণাবলির উৎসারণ। এটা সম্পূর্ণভাবে পদ্ধতিগত ব্যাপার যে পদ্ধতিতে ভাষাকে নবজন্ম দেয়া হয়, যাকে বলা হচ্ছে প্রকরণ। প্রকরণই হবে নতুন তথা অপরিচয়ের সমার্থক। যা অভিনব নয় তা সাহিত্যের প্রকরণ নয়, যা বিঘ্নিত ভাষা দিয়ে (impeded speech) প্রকরণকে ঋদ্ধ করে না তাও প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত নয়। কবিতার ভাববস্তু গুরুত্বহীন, সৌন্দর্যশূন্য, যেমন চাঁদ, আলো, লেক, নদী, গোলাপ, ফুল ইত্যাদি। এসব বস্তুভাবকে নতুন প্রকরণ প্রদানেই সাহিত্যগুণ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

ভাষাকে অপরিচিত করতে যে কলাপ্রকরণ সাহায্য করে তাকে তত্ত্ববিদ তিনিয়ানভ বলেন ধনুকায়ন বা প্রাক্‌প্রোথিতকরণ (foregrounding)। সাহিত্যকর্মকে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং আন্তঃক্রিয়াশীল উপাদানগুলোর সমন্বিত পদ্ধতিরূপে গণ্য করার সূত্রে এই ধনুকায়নের সৃষ্টি। এটি প্রোথিত উপাদানরূপে নির্ধারক হয় এবং সক্রিয়তার নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। শক্লোভস্কি যেখানে প্রকরণকেই অপরিচিতিকরণের নিয়ামক বলেন, তিনিয়ানভ সেখানে বলেন, কোনো নির্ধারক উপাদান যখন পূর্বপ্রোথিত থাকে এবং সকল সমান উপাদানকে বিপ্রকরণ করে তখনই কোনো রচনা হয়ে ওঠে সাহিত্যকর্ম। যেমন, সমতল ভূমি দেখতে দেখতে আমরা হঠাৎ পাহাড় প্রত্যক্ষ করে পার্থক্য অনুভব করি এবং চেনা সমতলকে পাহাড়ের বিপরীতে সমান জায়গা বলে উপলব্ধি করি। এই উভয় উপাদানই প্রাকরণিক, তবে তাত্ত্বিকদের আগ্রহ হল ওই প্রাক্‌প্রোথিত ও তার অন্য উপাদানগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতি। অর্থাৎ ধনুকায়ন বা প্রাক্‌প্রোথিতকরণ দুই দিক থেকে সক্রিয় থাকে — ব্যবহারিক ভাষার ওপর এবং অন্যান্য প্রকরণের ওপর। পার্থক্য প্রকাশের জন্যেই ধনুকায়ন ঘটে। এই ধনুকায়ন বা প্রাক্‌প্রোথিতকরণ হচ্ছে শব্দ, বাক্য, ছন্দ, ভাষা, চরিত্র, প্লট বা উপাদানকেন্দ্রিক। কাব্যিক ছন্দোস্পন্দের সাহিত্যগুণ নির্দিষ্ট কোনো ছন্দোস্পন্দের মধ্যেই প্রকাশ পেতে হবে এমন কোনো কথা নেই বরং তা আরো ভালোভাবে পাওয়া যাবে ছন্দোস্পন্দের ভাঙন বা বর্জনের মাধ্যমে। গ্রিক মানমন্দিরের কোনো একটি সারিও যেমন সঠিক ছন্দোবন্ধে সাজানো নয় অথচ চমৎকার সামঞ্জস্যপূর্ণ

তেমনি কবিতার ছন্দোস্পন্দনও একইভাবে ব্যত্যয়যুক্ত বা বিঘ্নিত ছন্দোস্পন্দ। আবার এই ব্যত্যয়ধর্মিতা যদি প্রথাগত হয়ে *ওঠে* তবে ভাষা স্থূলতায় পর্যবসিত হযে আর প্রকরণ হিসেবে কাজ করবে না। ওইসব উপাদান-কেন্দ্রিকতাই আবার সাহিত্যের জাত তথা জঁার (genre) গুলোকে ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ প্রকরণবাদের মৌলনীতি হল সাহিত্যগুণ সম্পন্নতা, এর গঠন হচ্ছে অপরিচিতিকরণ ও প্রাক্‌প্রোথিতকরণ বা ধনুকায়ন — যেটিকে বলা হচ্ছে স্বতঃক্রিয়করণের বিপরীত স্বাতন্ত্র্যমূলক শৈলী। আবার এইসব সূত্র সাহিত্য আর অসাহিত্যের পার্থক্য নিয়ে ব্যস্ত হয় না, সাহিত্যের ভেতরেই সেগুলিকে চিহ্নিত করতে হয় — কোনো অসাহিত্যের মধ্যে নয়।

তিন

প্রকরণবাদ রচয়িতা এবং সাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কেও সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। ওসিপ ব্রিকের মতে, সাহিত্যে রচয়িতামূলক ব্যক্তিত্ব নেই, শুধু সাহিত্যরচনাটি বর্তমান। একথা বলেছেন নিউ-ক্রিটিসিজমপন্থী টি এস এলিয়টও, আরো পরে রলাঁ বার্ত। কবিতা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়, বরং ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতি। রুশ প্রকরণবাদে আত্মজীবনী, রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গি এবং রচয়িতাভিত্তিক তাৎপর্যের কোনো মূল্য নেই। তাঁদের মতে, কোনো সাহিত্যকর্মের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক নিতান্তই সাধারণ, রচয়িতার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। রচয়িতা একজন নির্দিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বা কারিগর ছাড়া আর কিছুই নন; আর সাহিত্যের বিকাশ ঘটে কমবেশি সাহিত্যেরই স্ব-শাসনের পথ ধরে। ব্রিক বলেন যে পুশকিন না থাকলেও *ইভগেনি ওনেগিন* লিখিত হত, যেমন কলম্বাস না থাকলেও আমেরিকা আবিষ্কৃত হত। কবিকে এখানে দেখা হচ্ছে কল্প-প্রভু বা প্রতিভা হিসেবে নয়, তিনি একজন দক্ষ কর্মী মাত্র যিনি বিশ্বাস করেন তাঁর কাছে প্রতিভাত বিষয়বস্তুকে। তাঁর কাজ এখানে সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে জানা; তিনি জীবন সম্পর্কে কি জানেন না-জানেন তা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এই তত্ত্বে সাহিত্যের ইতিহাসকেও দেখা হয় প্রকরণের আলোতে। কালের গ্রাসে সাহিত্যিক রীতি বা কলাপ্রকরণের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়, যেমন অতিপরিচিত শৈলী 'প্যারডি'। এই শৈলীকে অপরিচিতিকরণের মাধ্যমে অথবা কোনো প্রাগ্বর্তী অচলিত কলাপ্রকরণকে প্রাক্‌প্রোথিকরণ বা ধনুকায়নের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ সাহিত্যের পরিবর্তন নির্দিষ্ট পরিবেশ বা রচয়িতার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে না, তা সাহিত্যের প্রাগ্বর্তী আধারের পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে। তাই ওই আধারকে পুনঃসৃষ্টির মাধ্যমে প্রকরণবাদীদের ধারণা রূপান্বিত হয়, রচয়িতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত প্রাতিস্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নয়।

পুনঃসৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকরণবাদীরা ব্যবহারিক ও কাব্যিক ভাষার বৈপরীত্যকে পরিহার করেন। তাঁরা ব্যবহারিক ভাষায় একটি বিশেষ বিন্যাস (set) দেখতে পান বা একে গুরুত্ব দেন বাস্তবতার নির্দেশক হিসেবে। আর গুরুত্ব দেন সঞ্চারের লক্ষ্যে অনুকূল কোনো কাব্যিক বৈশিষ্ট্যকে (যেমন অন্ত্যমিল বা অনুপ্রাস)। কিন্তু কাব্যিক ভাষায় কোনো নির্দেশক তাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন, জোর দেন এর প্রকাশের উপায়ের ওপর। ফলে কাব্যিক উচ্চারণের সঙ্গে কাব্যসৃষ্টির প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতের কোনো কার্যকর যোগসূত্র থাকে

না। এখানে তাত্ত্বিকেরা আবেগের ভাষা আর কাব্যিক ভাষার মধ্যে পার্থক্য নিয়েও কথা বলেন — যদিও কাব্যিক ভাষার সঙ্গে আবেগের ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে — বিশেষ করে ধ্বনিগত সাদৃশ্য। তাঁদের মতে, এ সাদৃশ্য বাহ্যিক, অভ্যন্তরে মৌল পার্থক্য বিদ্যমান। আবেগদীপ্ত বাক্যের ওপর বক্তার ব্যক্তিক নিয়ন্ত্রণ থাকে, অন্যদিকে কাব্যিক ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে কাব্যের নিজস্ব রীতি। এই ভাষা স্বয়ংসম্পন্ন বা স্বমূল্যবহ (self-valuable)। কাজেই সাহিত্য তৈরির স্বতন্ত্র ভঙ্গির নির্দিষ্ট বিন্যাস থেকে রচয়িতা বা কবি বিযুক্ত। সাহিত্য সমালোচনার উদ্দেশ্য রচয়িতাবিহীন সাহিত্যগুণকে আবিষ্কার করা। যেমন, শেক্সপিয়ারের সাহিত্য বিবেচনায় তাঁর ব্যক্তিজীবন অজানাই থাকে। অনেকে মনে করেন রোম্যান্টিক যুগে কবিরা নায়ক ছিলেন। তাঁদের জীবন ছিল কাব্যিক প্রকাশের অংশবিশেষ। কিন্তু প্রকরণবাদ মনে করে এসব কবির জীবন সৃষ্টি হয়েছিল কবিতার দ্বারা, উল্টোটি ঘটেনি।

প্রকরণবাদে বাস্তবতার স্থান নিয়েও জিজ্ঞাসা আছে। এক্ষেত্রেও বাস্তবতার ইতিহাসের প্রাধান্যকে উল্টে দেয়া হয়েছে। তাত্ত্বিকেরা বলেন যে সাহিত্য অন্যান্য সাহিত্য থেকে উৎসৃষ্ট হয়, কোনো অসাহিত্যিক উৎস থেকে নয়। সাহিত্য রচনায় ও বিশ্লেষণে বাস্তবতা অপ্রাসঙ্গিক। সাহিত্যের আধারের পরিবর্তন পরিবর্তিত বাস্তবতা দ্বারা নির্ধারিত হয় না, তা স্বতঃক্রিয় উপাদান ও প্রকরণ পুনঃনবায়ন দ্বারা নির্ধারিত হয়। নবায়নের ধারণা প্রকরণের অত্যাবশ্যকীয় দিক, এখানে আপাত সত্যও গ্রাহ্য হয় না। প্রকরণবাদীরা সাহিত্যিক প্রকরণের মূল্যায়ন করেন তার বোধি দিয়ে, তার অনুকারী সামর্থ্য দিয়ে নয়। চূড়ান্ত অর্থে তত্ত্বটি প্রকরণের সমস্যাগুলিকেই ব্যাখ্যা করে, বাস্তববাদের ভূমিকা দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং অনুবর্তীর। সাহিত্যের কাছে সাধারণ ভাষা, প্রচলিত সাহিত্যরীতি বা অলংকার যেমন, তেমনি বাস্তবতাও অনেক উপাদানের মধ্যে একটিমাত্র। এটি সাহিত্যের নির্দেশক বা লক্ষ্য নয়। মালার্মের ভাষায়, 'কাব্যিক ফুল ফুলদানিতে প্রাপ্তব্য নয়'। কোনো সাহিত্যকর্মে বাস্তবতাকে নির্দেশ করা হলে (যেমন, পুষ্প ওখানে বর্তমান আছে) প্রকরণবাদীরা একে মনে করেন সৌন্দর্যতত্ত্বের একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মাত্র যা প্রকরণতত্ত্বের বোধির সঙ্গে বিপ্রতীপ। যেহেতু সাহিত্য অপরিচিতকরণের মধ্য দিয়ে রচিত হয় তাই বাস্তবও একটি সংশ্লিষ্ট উপজাত হয়ে ওঠে মাত্র, সরাসরি অনুকৃত হয় না।

এ ঘরানার অনুসারীরা ভাব বা আইডিয়া সম্পর্কেও ঐতিহ্যানুসারী ধারার বিপরীতে যান। তাঁরা সাহিত্যের ভাবকেন্দ্রিক কোনো তাৎপর্য এবং ধারণা কোথাও দেখেন না। বাস্তবতার মতো এসবও সাহিত্যে মাত্র মালমশলা হিসেবে প্রবেশ করে। এসব ক্রিয়াশীল কলাপ্রকরণ হিসেবে সাহিত্যিকভাবে ব্যবহৃত হয় মাত্র। ইয়াকবসনের মতে, আমাদের কাজের মর্মসার চিন্তা বা আইডিয়াকে নিয়ে নয়, বাচনিক (verbal) ঘটনাবলি নিয়ে। রচয়িতার বাস্তবতা ও আইডিয়া বা ভাবের সাহিত্যিক অবস্থানগত নির্দিষ্টতাকে প্রকরণবাদীরা বিবেচনা করেন সাহিত্যগুণ এবং অপরিচিতিকরণের ভিত্তিতে। এর ফলে সাহিত্য এমন এক বিশুদ্ধতার লক্ষ্যে ধাবিত হয়েছে যে সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রকরণকে আধেয় বা বিষয় ও রচয়িতার ওপরে এক স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং আধার-আধেয় শব্দদ্বয়কে প্রতিস্থাপন

করা হয়েছে material ও device — বস্তু ও প্রকরণকলা দিয়ে। শক্লোভস্কির মতে, ডিভাইসই উপন্যাসের বিষয়বস্তু গঠন করে। একবার কোনো ডিভাইস প্রাক্‌প্রোথিত হলে এই ডিভাইস ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

চার

প্রাককরণবাদের লক্ষ্য যদিও কোনো বিশেষ সাহিত্যকর্ম নয়, সাহিত্যগুণ এবং এই গুণ রয়েছে নতুনত্ব ও ব্যত্যয় রূপের মধ্যে, তাই ক্রমসচেতনতা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সকল সাহিত্যকর্মে সাহিত্যগুণ একইভাবে নির্মিত হয় না। যেসব কলাপ্রকরণ কাহিনিমূলক গদ্যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে, তা গীতিকবিতায় ভিন্ন রূপ নেয়। কারণ কবিতার ক্রিয়াশীল স্বাতন্ত্র্য হল ব্যবহারিক ও কাব্যিক ভাষার মধ্যকার স্বাতন্ত্র্য, যা গদ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গদ্যে তার রূপ হচ্ছে আকর-কাহিনি এবং শিল্পিত কাহিনির স্বাতন্ত্র্য যেটি কাহিনির গঠন, উপস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই দুই ক্ষেত্রে প্রকরণবাদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, যদিও শুরুটা করেছিল কবিতার প্রকরণ নিয়ে। ইয়াকবসনের কথায়, কবিতা হল 'সাধারণ ভাষার মধ্যে সংঘটিত পরিকল্পিত লঙ্ঘন'। কবিতার তিনটি ক্ষেত্রে এই লঙ্ঘন সংঘটিত হয় — ধ্বনি-অনুষঙ্গ, বাক্যতত্ত্ব ও ছন্দোস্পন্দন।

'কবিতা এমন এক ভাষায় রচিত যা সংঘটিত হয় তার সামগ্রিক ধ্বনি-অনুষঙ্গে'। তা শুধু গীতিশোভন সাধারণ উচ্চারণ নয়। কবিতার প্রকরণ উচ্চারণের রূঢ়ায়ন (toughening) বা বিঘ্নায়ন (impeding)-এর আবহ আনে। 'দুরুচ্চার্য একই ধ্বনিসমূহের সহাবস্থান' (শক্লোভস্কি, ১৯৬৫) লক্ষ্যযোগ্য হয়। ব্যবহারিক ভাষায় অবহেলিত অনেক ধ্বনি-উপাদান কবিতার কলাপ্রকরণে প্রাক্‌প্রোথিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে-র কবিতায় ব্যবহৃত দুরূহ শব্দধ্বনি সম্পর্কে নেতিবাচক বক্তব্য দিয়েছিলেন।

বাক্যতত্ত্ব ও ছন্দোস্পন্দ হচ্ছে শব্দসংস্থাপনার দুই স্বতন্ত্র রীতি। বাক্যতত্ত্ব সাধারণ ভাষাকে তীব্রতা দেয়, ছন্দোস্পন্দ কবিতায় আরেক ধরনের নির্ধারণী নীতি গঠন করে। উভয় নীতি কবিতার বোধনকে সক্রিয়তা দেয়। এখানেও তত্ত্ববিদরা সাধারণ ভাষা ও কবিতার ভাষার স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দিয়েছেন। সাধারণ ভাষার শব্দে লুকানো বিশেষ বিশেষ দিকের ওপর ভিত্তি করেই নির্দিষ্ট বাচনিক গঠনের কাব্যিক ভূমিকা প্রাধান্য পায়। ভাষার রাজ্য থেকে গীতিময়তার রাজ্যে কবিতার রূপান্তরকরণকে বিশ্লেষণ করাই সাহিত্য-সমালোচকের কর্তব্য। অর্থতত্ত্ব সম্পর্কেও প্রকরণবাদ অর্থলঙ্ঘনের বিষয়টিকে চিহ্নিত করে। কোনো শব্দের দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোনো সহ-অর্থকে যুগপৎ দ্যোতিত করে কবিতা হয়ে ওঠে অপরিচিত। এ কৌশলে অবশ্য সাধারণ যোগাযোগ ব্যাহত হতে পারে। সাধারণ শব্দে একটি অর্থই যোগাযোগ তৈরি করে, কিন্তু যখনই শব্দ কবিতাগত হয় তখন সেটি ভাষার সাধারণ স্তর থেকে বেরিয়ে এসে নতুন তাৎপর্য-আবহে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, নিউ-ক্রিটিসিজমে শব্দের যে দ্ব্যর্থকতা প্রাধান্য পায় প্রকরণবাদে ওইভাবে কবিতায় কূটাভাষ অনুসন্ধেয় হয় না। কারণ তাৎপর্য নিয়ে এখানে আগ্রহ নেই

বলে দ্ব্যর্থক অর্থ বিশ্লেষণীয় নয়, অর্থতত্ত্বসহ কবিতার প্রতি স্তরেই এই প্রকরণবাদ ব্যবহারিক ভাষা থেকে কবিতার ভাষাকে পৃথক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। এবং এসবই ঘটে অপরিচিতকরণের মাধ্যমে। তাই বাকপ্রতিমা, অতিশয়োক্তি, উপমা, তুলনা, দ্বিরুক্তি বা যেকোনো লক্ষণা সাধারণ ভাষায় কাব্যিক লঙ্ঘন বা বিঘ্নতা সৃষ্টিতেই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এসব কাব্যের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা নয়, প্রভেদ বা পার্থক্য সৃষ্টিকারক মাত্র।

গদ্যশিল্প ব্যাখ্যায় প্রকরণবাদীরা কবিতার প্রতি যে মনোভাব তার দ্বারাই প্রভাবিত বা নির্ধারিত থাকেন। তবে দুইয়ের সমান্তরাল অবস্থান সত্ত্বেও শক্লোভস্কি একথাও বলেন যে, গদ্যে কবিতার মধ্যে প্রবলভাবে পার্থক্য-নীতিটি কাজ করে না। গদ্যে বরং বিভিন্ন বাক্যের মধ্যকার ক্রিয়াশীল বৈপরীত্যমূলক প্রভেদ বা পার্থক্যকারী ভূমিকাটি তৈরি করা যেতে পারে। অর্থাৎ গদ্য আকর কাহিনি এবং শিল্পিত কাহিনির মধ্যকার প্রভেদ-নির্ভর। আকর কাহিনি নির্দেশ করে ঘটনার ক্রমপরম্পরা বা ক্রমরূপ, শিল্পিত কাহিনির দ্বারা নির্দেশ করা হয় সাহিত্যে কাহিনি যে-নিয়মে ও যেভাবে বর্ণিত হয়। শিল্পিত-কাহিনি আকর-কাহিনিতে অপরিচিতিকরণের আবহ সৃষ্টি করে। শিল্পিত-কাহিনির প্রকরণ আকর-কাহিনিকে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সজ্জিত হয় না, বরং তা আকর-কাহিনির মধ্যেই প্রাক্‌প্রোথিত হয়। কাহিনির সামগ্রিক উপস্থাপনা থেকে ভাষার ব্যবহার — সর্বত্র এই প্রকরণ বৈশিষ্ট্যে এবং ব্যবহারে একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারে। যেমন গোগলের 'ওভারকোট' গল্পের গতিশীলতা নির্মিত বর্ণিত ঘটনার মধ্যে নেই, আছে উপস্থাপনার ভঙ্গির মধ্যে। যা শেষ পর্যন্ত নির্ভেজাল ভাষিক কলাপ্রকরণের সৃষ্টি হয়ে ওঠে।

শক্লোভস্কি তাই উপন্যাস-কাহিনি সমালোচনায় দেখিয়েছেন যে, শিল্পের নিয়মকানুন দ্বারা শিল্পের প্রকরণগুলো বিশ্লেষণযোগ্য; প্রকরণগুলো তাদের বাস্তবতা দ্বারা বিচার্য বা নির্ধারিত নয়। গল্পে বা কাহিনিতে শুধু পরিবেশ বা ঘটনার প্রভাবমুক্ত প্রকরণ থাকবে, যেমন উপকাহিনির সংযুক্তি, বিচিত্র দিকে নানান ঝোঁক সৃষ্টি, কারণের পূর্বে কার্য প্রকাশক বৈষয়িক ও কালিক পুনর্বিন্যাসকরণ ইত্যাদি দ্বারা শিল্পিত-কাহিনিতে আকর-কাহিনি বিচূর্ণিত হয়, আকর-কাহিনির ঐক্য নষ্ট হয়। নিউ-ক্রিটিসিজমে জয়েসের *ইউলিসিস*কে প্রায় বাতিল করে দেয়া হয় এই অর্থে যে, রচনাটি 'শীতলান্তিক' (dead-end), আঙ্গিকটি গতানুগতিক ভাব, নৈতিকবোধ ইত্যাদি সীমিত বিষয়কে প্রকাশের একটি উপায় মাত্র। কিন্তু প্রকরণবাদীরা জয়েসের উপন্যাসে আকর-কাহিনি বা বাস্তবকে উপলব্ধির জন্যে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এর কলাপ্রকরণকে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী হন।

সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে এই তত্ত্ব যে অবদান রেখেছে তা আমাদের উপহার দেয় সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষায়নের জন্য তৃতীয় একটি প্রভেদক বা পার্থক্যকারক বৈপরীত্য। তাদের মতে, কবিতা ও গদ্যশিল্পের মতোই সাহিত্যের ইতিহাসও সাহিত্যের অভ্যন্তরের স্বতঃক্রিয় এবং বোধিজাত প্রকরণের পার্থক্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই পার্থক্যকে বা প্রভেদক উপাদান মৌলিকভাবে পার্থক্য রচনা করে পূর্ববর্তী সাহিত্যের ইতিহাস বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। কারণ গতানুগতিক ধারণায় সামগ্রিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রকরণবাদ ব্যাখ্যা করে যে, সাহিত্যিক ভাষা এবং এর বিকাশকে কোনো ঐতিহ্যের

পরিকল্পিত বিকাশ হিসাবে বোঝা যায় না, বরং বোঝা যায় 'ঐতিহ্যের ব্যাপক প্রতিস্থাপন' হিসাবে (তিনিয়ানভ, ১৯৭৮)। সাহিত্যগুণ হচ্ছে ঐতিহ্য গঠনকারী নিয়ামকসমূহের সৃষ্টি। অর্থাৎ এখানে ঐতিহ্যের ধারণাকে ভেঙে দেয়া হয় এবং একইসঙ্গে তা নির্দিষ্ট সাহিত্যের কলাপ্রকরণ ও সামগ্রিকভাবে সাহিত্যিক প্রক্রিয়ার আন্তঃসম্পর্কে অন্য ধরনের ঐতিহাসিক মাত্রা সূচিত করে। ঐতিহাসিক প্রাগসরতার ভিত্তি হিসাবে ধারাবাহিকতার স্থান দখল করে অধারাবাহিকতা (descontinuity)। সাধারণ সাহিত্যের ইতিহাসে অবহেলিত হয় প্রকরণ, আর প্রকরণ-আসক্ত সাহিত্যের ইতিহাসে অধরা থেকে যায় ইতিহাস। এই উভয় ধারণার বিপরীতে রুশ প্রকরণবাদ ধারণা দেয় যে, ইতিহাস স্বয়ং সাহিত্যের বিশেষত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ করে দেয়।

মোটামুটিভাবে বলা যায় — প্রকরণবাদীদের মতে, সাহিত্যের বিবর্তনে দুটি পরিপূরক শক্তি কাজ করে। প্রথমটি হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সাহিত্যের বর্গ বা জাঁর এবং যুগ তৈরিতে কোনো নির্ধারক কলা-প্রকরণসমূহ। এগুলো ব্যবহৃত হতে-হতে পুরানো হলে তা পুনঃসঞ্জীবিত হয় ব্যঙ্গাত্মকভাবে বা অন্য রীতিতে। এভাবেই চলতে থাকে সাহিত্যের ইতিহাসগত বিবর্তন। আবার, জনপ্রিয় বা প্রান্তিক ধারা বা জাঁর ব্যবহার করে সাহিত্যিকেরা মূলধারার অচলতাকে দূর করতে পারেন, নতুন প্রকরণশৈলী গড়তেও পারেন। এরকম পুনঃসঞ্জীবন, নবায়ন বা অচলতা নিরসনে অন্যান্য বিবর্তনবাদী নীতিও সংশ্লিষ্ট থাকে। যেমন, দস্তয়েভস্কি বটতলা জাতীয় উপন্যাসকে তাঁর সাহিত্যিক রীতিপ্রকরণে উন্নীত করেছিলেন, চেখভ ব্যঙ্গপত্রিকার বৈশিষ্ট্য চয়ন করে তাকে রুশ সাহিত্যিক-গদ্যের জাতে তুলেছিলেন। এসব প্রয়াসকে বলা যাবে অধারাবাহিক বিবর্তনবাদী প্রণালী। এটা এমন যে, মনে হয় উত্তরাধিকার বা ধারাবাহিকতা আসে "পিতা থেকে পুত্রে নয়, চাচা থেকে ভাতিজাতে"। এখানেও সক্রিয় থাকে অপরিচিতিকরণের ক্রমাগত প্রতিস্থাপন পদ্ধতি। ফলে সাহিত্যের ইতিহাস আর বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যনীতিগুলোর উৎস নিছক ব্যাখ্যার মধ্যে সীমিত রইল না, তা গণ্য হল না কোনো ধরনের ঐতিহাসিক প্রবাহন হিসাবেও। অতএব, চূড়ান্ত অর্থে বলা যায় "সাহিত্যের ইতিহাসে ভূমিকা হল — মূলত প্রকরণকে স্ফুটিত করা।" (তিনিয়ানভ, ১৯৭৮ : ২১৩)

প্রকরণবাদের লক্ষ্য ছিল একটি নির্দিষ্ট বৌদ্ধিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা। প্রশ্ন ওঠে, এ তত্ত্ব কি পূর্বনির্ধারিত, বুদ্ধিবৃত্তিক আসক্তিজাত? না কি এটি বিস্ময়করভাবে প্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ? তাত্ত্বিকেরা সবসময়ই তাঁদের তত্ত্বটির সাময়িক বা কালিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে গুরুত্বদানের জন্য সৎ ও নিবিষ্ট থেকেছেন। কারণ তাঁদের গদ্য ও সাহিত্যের ইতিহাস ব্যাখ্যার মধ্যেই ধরা পড়ে যে, তাঁরা কবিতাকেন্দ্রিক হলেও অন্যান্য প্রসঙ্গকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁদের অভিপ্রায়ই ছিল সাহিত্যগুণ ও তার সংজ্ঞায়নকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলা। সংজ্ঞায়নের মধ্যে বিষয়কে বিশেষায়িত করে, এর ভিত্তি হিসাবে 'প্রভেদক' কৌশলকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁরা তত্ত্বটিকে করে তোলেন অপরিসীম সৃষ্টিশীলতা ও অভিযোজন-ক্ষমতার অধিকারী। বিশ শতকের প্রধান কয়েকটি সাহিত্যতত্ত্বে প্রকরণবাদী তত্ত্বের প্রত্যক্ষ/অপ্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। ভাষার ওপর গুরুত্ব-আরোপ, জীবনীমূলক উপাদানকে স্বল্পমূল্যদান, সাহিত্যবিজ্ঞানের ধারণা, প্রথাগত নীতি থেকে সরে আসার ওপর

গুরুত্বপ্রদান ইত্যাদি ধারণা দিয়ে ইয়াকবসন থেকে রলাঁ বার্ত পর্যন্ত অনেকের চিন্তাকে প্রভাবিত করে প্রকরণবাদ সাহিত্য-সমালোচনা তত্ত্বের কয়েকটি মৌলিক গতিধারা তৈরি করে দিয়েছিল।

তবুও, প্রকরণবাদের কতিপয় সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যায়। তত্ত্বটি তীব্রভাবে সাহিত্যপরতায় মনোযোগী। এখানে যেসব অসাহিত্যিক উপাদানকে পৃথক করা হয়েছে সেগুলো সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। ভাষা সম্পর্কেও কোনো উন্নত তত্ত্ব তাঁরা দিতে পারেননি এবং সমাজ সম্পর্কেও নয়। সামাজিক মাত্রাগুলো থেকে তাঁরা বিযুক্ত। তাই মার্কসবাদীরা যেমন এটির সমালোচনা করেন, বাখতিনের তত্ত্বেও এর কড়া বিরোধিতা করা হয়। বাখতিনের চিন্তাধারা অনুযায়ী ভাষার সকল ধরনের ব্যবহার, এমনকি সাহিত্যিক ব্যবহারও সামাজিক ও মতাদর্শিক। সাহিত্যকে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেই কেবল আরো সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ইতিবাচকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। বাখতিনের মতে, সাহিত্য ও সাহিত্যে প্রকাশিত বাস্তবতা একই পর্যায়ের, তার মধ্যে প্রভেদক বা পার্থক্যের সীমারেখা নেই। এই পর্যায়টি হল মতাদর্শ। সাহিত্যে মতাদর্শ থাকবেই, তা চিহ্নিত বা আবিষ্কার করাই সমালোচকের কাজ।

সাংগঠনিক তত্ত্বে (structuralism) সাহিত্য ও বাস্তবতা সম্পর্কে ব্যাপক ও অধিক স্থিতিস্থাপক রূপে ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে। এখানে সাহিত্য ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে চিহ্নায়নের মাধ্যমে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যেন তারা একই পর্যায়ভুক্ত। তাই বলা যায় যে, সাহিত্য সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে ভাষাকে কেন্দ্রীয় মর্যাদা দিলেও প্রকরণবাদীরা ভাষার তত্ত্বকে বিকশিত করতে পারেননি। তাঁদের বাস্তবতা সম্পর্কিত ধারণাও সংস্কৃতির ফাঁদে আটকা পড়েছে, কারণ এই ধারণাকে তাঁরা সাহিত্যের তত্ত্ব দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। এই সমস্যার মূলে আছে তাঁদের সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণা। অধারাবাহিক ক্রম হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসকে দেখার ফলে অন্যান্য ইতিহাসের সঙ্গে এর সম্পর্ক-সূত্র নির্ধারণে ব্যর্থতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে এ কথাই মনে হয় যে, যেকোনো তত্ত্বেই — তা যতই সাহিত্যপর হোক না কেন তাতে অসাহিত্যিক বিষয় সম্পর্কে সমৃদ্ধ একটি তাত্ত্বিক বিবেচনা থাকতে হবে। সবচেয়ে বেশি দরকার ভাষা-বিষয়ক চিন্তাতত্ত্বের স্বচ্ছতা দিয়ে সাহিত্যতত্ত্বকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করার শক্তিমত্তা।

তবুও, রুশ প্রকরণবাদ এক ব্যাপক সাহিত্যচিন্তা। সাহিত্যের নানা পক্ষ নিয়েই তা বিপরীত চিন্তা উপহার দিয়েছে। তত্ত্বটি যেন বিপরীতবাদী হওয়ার অনিবার্যতাকে প্রতিপন্ন করেছে। এখানেই এর মৌলিকত্ব। বাংলা ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কবিতায় আমরা অপরিচিতিকরণের প্রবল প্রয়াস লক্ষ করি। যদিও লেখককেন্দ্রিক বা দশককেন্দ্রিক সময় স্তরে সাহিত্যকে সীমাবদ্ধ বা চিহ্নিত করা যায় না, তবে, আলোচনার জন্য প্রকাশের তারিখের ধারা বিবেচনায় রেখে একটা সারি তৈরি করা যায়। নিচে বিগত প্রায় সত্তর বছরের বাংলা কবিতার প্রকরণ কীভাবে অপরিচিতিকরণকে ব্যবহার করেছে তার নমুনা দেয়া হল :

তিরিশের দশক

যা কিছু লিখেছি আমি — হোক যৌবনের স্তব, অন্ধ জৈব
আনন্দের বন্দনা হোক না —
যা কিছু লিখেছি, সবই ভালোবাসার কবিতা,
...
আজ যদি ভাবি মনে হয়
নারীরে, বাণীরে এক মনে হয়। মনে হয় আমার তনুর তন্তুর সীবনে
যে-কবিতার ভালোবাসা ছিল, তারই শ্বেত শিখার পদ্মেরে
ফুটিয়েছি মনে মনে নারীরে মৃণাল করে;
(মৃত্যুর পরে; জন্মের আগে, বুদ্ধদেব বসু)

নতুন ননীর মতো তনু তব? জানি তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে কুৎসিত কংকাল —
(ওগো কঙ্কাবতী, বুদ্ধদেব বসু)

মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে
স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা, শ্লথনীবি যৌবন তোমার
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার
আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে।
(হৈমন্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

তোমার সৌন্দর্য নারী, অতীতের দানের মত
... ...
তবু নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো
এখনো নারী মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।
(মিতভাষণ, জীবনানন্দ দাশ)

চল্লিশের দশক

তার দেহে আর আমার আছে মধ্যযুগের কাব্যের বরতনু। স্পর্শের নির্ণয়ে
বিগলিত পাথরের মতো। প্রতি অঙ্গেই যেন হৃদয়ের উপক্রমণিকা।
উন্মাদনার বিভ্রান্তি নেই, কামনার বিহ্বলতায় অচেতনতা নেই, কিন্তু সৌরভ ও সমৃদ্ধিতে
আছে। কম্পমান তরঙ্গ শুধু সমুদ্রেরই সঞ্চয় নয়, অথবা
বাতাসে ধানের ক্ষেতেরই নয়, অথবা ঊষালগ্নে লঘু মেঘের গতিবিধিতেই নয়,
তার দেহেরও সঞ্চয়। তার সমগ্র দেহ একটি প্রসন্ন সময় উদযাপনের নিভৃত কৌতূহল। ...
... আমার করাঙ্গুলি তার দেহকে স্পর্শ করে কামনার উদ্ঘাটন
করে নি, কিন্তু হৃদয়কে উন্মোচিত করেছে। এ-স্পর্শের অবক্ষয় নেই।
(উচ্চারণ : ১৩, সৈয়দ আলী আহসান)

প্রেম নেই তবু প্রেমের কান্না মরেনি
তুমি নেই তবু তোমাকে পাওয়ার বাসনা সোনা ঝরেনি
এই সর্পিল জীবনের পথে আলগোছে ছুঁয়ে যাওয়া
তুমি যেন কোনো চৈত্র রাতের দূর সমুদ্রে হাওয়া!
(অশেষ : যাও, উত্তরের হাওয়া, আহসান হাবীব)

পঞ্চাশের দশক

তুমি হে সুন্দরীতমা নীলিমার দিকে তাকিয়ে বলতেই পারো
'এই আকাশ আমার'
কিন্তু নীল আকাশ কোনো উত্তর দেবে না।
সন্ধ্যেবেলা ক্যামেলিয়া হাতে নিয়ে বলতেই পারো,
'ফুল তুই আমার'
তবু ফুল থাকবে নীরব নিজের সৌরভে আচ্ছন্ন হয়ে।
(উত্তর, শামসুর রহমান)

মনোগত বাসনা বিলাস জ্বলে যেন রাত্রিভর
প্রমিত প্রদীপ এক পুরাতন স্বর্ণ দীপাধারে
অন্তিম প্রস্তাব তার অলৌকিক নারীর চুম্বন।
(মহিলাকে শিল্পীর উত্তর, সৈয়দ শামসুল হক)

ষাটের দশক

ঘুরিয়ে গলার বাঁক ওঠো বুনো হংসিনী আমার
পালক উদাম করে দাও উষ্ণ অঙ্গের আরাম,
নিসর্গ নমিত করে যায় দিন, পুলকের দ্বার
মুক্ত করে দেবে এই শব্দবিদ কোবিদের নাম।
(সোনালি কাবিন, আল মাহমুদ)

একদিন একটি লোক এসে বললো, 'পারো'?
বললাম, 'কি'?
'একটি নারীর ছবি এঁকে দিতে' সে বললো আরো,
'সে আকৃতি
অদ্ভুত সুন্দরী, দৃপ্ত, নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে —
পেতে চাই নিখুঁত ছবিতে।'
'কেন? আমি বললাম শুনে।
সে বললো, 'আমি সেটা পোড়াবো আগুনে।'
(একদিন একটি লোক, ওমর আলী)

নিঃশব্দ থাকবো আমি। তুমি কথা। তুমি মুখরতা।
তুমি চিল নীলিমার, উড়বে ওপরে, আমি দেখবো;
স্পর্শের দেবো না ঘাম, তুমি শোবে রুমালের সুবিধায়
ঠোঁট কষ্ট পেলে স্যাপে, ন্যাপকিনে আমিও রুখবো।
পবিত্র উত্তাপ শুধু, কবিতার জন্যে; আপাতত
ছলনায় সুখ পাওয়া — যেহেতু মৃত্যুও খুব কাছে;
দিও না অধিক ঝড়, বুনো গন্ধ, অন্য জটিলতা —
(উত্তাপ শেষ শীতে, সিকদার আমিনুল হক)

আমি তোমার সামনে আবার নতজানু হয়েছি, নারী
না, প্রেমে নয়, আশ্লেষে নয়,
ক্ষমা চেয়ে

তোমার দয়া দিয়ে আমার হৃদয় ধুয়ে দেবার প্রার্থনায়
...   .
আজ আমি সমস্ত পুরুষের হয়ে তোমার ক্ষমাপ্রার্থী।
(কর্তৃত্ব গ্রহণ কর, নারী; ফরহাদ মজহার)

সত্তরের দশক

রাত্রে তোমাকে স্বপ্নেও দেখি
গণিকালয়ের সারিতে একটা
আমারি মুখের মতন হাজার
মুখের মিছিল
তোমার জন্যে প্রতীক্ষায়।
(প্রিয়তমাসু, শহীদ কাদরী)

অতটুকু চায়নি বালিকা!
অত শোভা, অত স্বাধীনতা!
চেয়েছিল আরো কিছু কম,
আয়নার দাঁড়ে দেহ মেলে দিয়ে
বসে থাকা সবটা দুপুর, চেয়েছিল
মা বকুক, বাবা তার বেদনা দেখুক!
(নিঃসঙ্গতা, আবুল হাসান)

বারান্দায় স্বাতী কমলা খেলো, তার
শাড়ির উপরে সমস্বরে সকালে বসলো রোদ,
রোদের পারদ লেগে স্বাতীর সমস্তটা মুখ যেনো আয়না, গভীর আয়না।
(স্বাতীর সঙ্গে সকাল, আবুল হাসান)

তোমাকে মানাতো প্রত্নবেদীতে পঞ্চালিকায়
গোপীচন্দনে তিলক পরালে বৈষ্ণব কবি;
কোলাহলময় বিশ-শতকের শেষপাদে কেন এলে?
কী দিয়ে তোমার বন্দনা করি
নারীকীর্তনে ব্যবহৃত সব উপমা দিয়েছি ফেলে!
(প্রত্নরমণী, আবিদ আনোয়ার)

একটি গাছের সঙ্গে নিঃসঙ্গ লতার
ঝর্নার সঙ্গে হলো হরিণীর
ফুল অলি, ফল আর পাখির হয়েছে
কী আশ্চর্য! আমাদেরই বাকি
তোমার আমার শুধু কাবিনের লেখাজোখা
বিবাহ হলো না আমাদের।
(বৃক্ষমঙ্গল-৪, নাসির আহমেদ)

আশির দশক

ফুটন্ত শিরার তাপ স্নিগ্ধ হলে বিকেলের ধূসর আলোয়
এলো নারী কম্রমুখ প্রস্ফুটিত নবীন ভ্রমর
আমার দু'হাতে দিয়ে বলল, শোন, তুমিই জনক।
(তিন রমণীর ক্বাসিদা, খোন্দকার আশরাফ হোসেন)

আ! তুমি আমার হাতের এতটা নাগালে
আকাঙ্ক্ষার এত কাছে অন্ধকার বেলিফুল!
নির্মীয়মান ব্রিজের ওদিকে জোনাকির আলো ম্রিয়মান
কখন কলাবাগানের রূপকথা আমাকে বুঝালো
নিবিড় শব্দের খুব ভেতরের শ্বাস।
আ! দুটি মানুষের মাথা এক সুতোয় বেঁধে দেয় অন্ধকার
এক সময় তুমি ভয়াবহ চুপ থাকো ঝরনার কিনারে!
(নিবিড়, সরকার মাসুদ)

নারীকে নয় ভাল নারীত্বকে বাসি
মর্মশ্বাস তার অপূর্ব;
নারীর প্রেম নয় প্রেমের প্রেমে মজে
নিজেকে মনে হয় কী উর্বর!
আমার কৃষ্ণজি নিবিড় ভালোবেসে
জড়িয়ে ধরে যেই রাধাকে,
আমার আধখানা গভীর শিহরনে
মিলনে টানে আর আধাকে
(রাধাকে, সৈয়দ তারিক)

কেবলই অরূপ হয়ে ঘুরে মরা, রূপের চৌপাশে
কেবলই ছায়ার মতো ঘুরঘুর, কায়ার সকাশে।
মজে গিয়ে দ্রব্য কামে বস্তু আর বাসনায় ভাবে
ভাণ্ড ছেড়ে ভাণ্ডী আর কীভাবে বা কতদূর যাবে?
(অন্ধ, মাসুদ খান)

তোমার ফিরোজা চুলে আকাশ-চোঁয়ানো মধুরিমা
চরণ তলায় দলে আমার ইন্ডিগো নার্সিসাস :
প্যান্ডোরা, খোল না তুমি শরীর আমার।
(শ্রী শ্রী ভগবানুবাচ, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ)

নব্বইয়ের দশক

কে ধরেছে কার অঙ্গ, এটা কি মনীষা কৈরালার হাত? মৌলবীর
ছেলে রাতে স্বপ্নে দেখেছে তাকে, ঘুম থেকে ছুটি নিয়ে সে ছুটেছে
তারকার দিকে; কিছুদূর গিয়ে দেখে, পুকুরের পাড় ঘিরে উঁচু উঁচু গাছগুলি
নড়ছে বাতাসে। কার কোমর কে দেয় দুলিয়ে এই ঝাপসা
আকাশপর্দায়? নির্জনতা থেকে ছুটে আসছে প্রত্যুষের ট্রেন।
(চঞ্চল আশরাফ)

একটি জরায়ুর বৈধতা দিয়ে রাষ্ট্র আমাকে বলেছে,
ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট। কিন্তু জরায়ুর
গভীরে পা রাখতেই আমি অজস্র সন্তানের শুভেচ্ছা পেতে থাকি
আমি তাদের কাউকে এড়াতে পারি না;
সঙ্গমকালীন জরুরি নিরাপত্তার জন্য এবার রাষ্ট্রের কাছে আমি
একদল দাঙ্গা-পুলিশ চাইব।

(আলফ্রেড খোকন)

শেষমেষ দেখেছি সম্পর্ক একদিন
বিশেষণ থেকে সরে এসে
বিশেষ্যে দাঁড়িয়ে যায়!
ফলে সে নিজেকে ভাঙে, ভেঙে দু'টুকরো হলে
এক টুকরো তুমি নিয়ে যত লাভ কর,
অন্য টুকরো আমার তেমন কাজেই আসে না।

(সম্পর্ক সম্পর্ক, টোকন ঠাকুর)

কবিতার নারী রূপ, গুণ, কথকতার ধারায় কীভাবে প্রাকরণিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয়েছে তার দৃষ্টান্ত ওপরের উদ্ধৃতিগুলোতে দৃশ্যমান। চর্যাকবির শবরী বালিকা আসীন ছিল 'মোরঙ্গি পিচ্ছ' পরে, ডোম্বী ছিল পদ্মের পাপড়ির ওপর নৃত্যরত। পদাবলির রাধা সেখানে ত্রস্তচকিতা অভিসারিকা ও অশ্রুসিক্ত চিরবিরহিণী। প্রণয়োপাখ্যানের জুলেখা পুরুষ প্রেমে উন্মাদিনী হয়ে তার পশ্চাতে ধাবিতা, মনসামঙ্গলের বেহুলা বিদ্রোহিনী, চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা বারমাস্যার গীতে তুলে ধরে তুখোড় বাস্তবতার কথা। ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া-মদিনা-মলুয়ারা যেন প্রকৃতির এক-একটা গহীন নদী। উনিশ শতকের উপন্যাসে এসে এইসব নারীর প্রকরণ বদলে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা-কপালকুণ্ডলা-কুন্দনন্দিনীরা হয়ে ওঠে সক্রিয় তৎপরতায় বিচিত্র — প্রেমে-স্বাধীনতায়-অধিকারবোধে। রবীন্দ্রনাথের নারী করুণাময়ী আর ছলনাময়ীর মুখশ্রীতে ভিন্ন প্রকরণ গড়ে তোলে — সে-ই হয় কবিসত্তার আধার। নজরুল তাকে এনে দেন তারার ফুল। তাঁর নারী সৌন্দর্য ও ইন্দ্রিয় সংরাগের মিশেলে বেদনাবিধুর প্রকরণে বিমণ্ডিতা। তাঁর নারী আবার এক অর্থে অবমানিত দমিত ও শেষে বিদ্রোহিনী। বুদ্ধদেব-সুধীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের নারীরা শরীরী, অথচ চিরঅধরা, কখনো মেধাবী লাবণ্য ও নিশ্চেতনায় নক্ষত্রদ্যুতির সুদূর আলোকণা, কখনো বা স্মৃতিনায়িকা। তিরিশের এইসব নারী-প্রকরণ, ভাষা-প্রকরণ বদলে দেয় পূর্ববর্তী নারীসিরিজের ধারাবাহিকতা। নারীর কুৎসিত কঙ্কাল বা ক্ষণিকত্ব দেখানো সত্ত্বেও তাঁরা নারীকে আশ্রয়স্থল হিসেবে ধারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতল বাণীরূপের শাশ্বতবাদ এঁরা ভেঙে দিয়েছেন। এই প্রকরণ নতুন।

চল্লিশের দশকের নারী হৃদয়যুক্ত, না পেলেও তাকে যেন পাওয়া গেছে। কবিরা কবিতার শরীরকে করেছেন নির্মেদ, কমিয়েছেন ঘনত্ব — তিরিশের কবিদের প্রকরণ থেকে হয়েছেন আলাদা। পঞ্চাশে এই প্রকরণ আশ্রয়ী হয় কলাবতী — সৃষ্টিশীল নারীর, নদী ও নারীকে এক করে প্রাকৃতিকায়নের নতুন বয়ান রচিত হতে থাকে। আমরা প্রত্যক্ষ করি খোলাখুলি ভাষা, দীর্ঘ বয়ান, বৈঠকি আলাপচারিতা, গল্পময়তা। নারীর মনোগত

বাসনাকেও পঞ্চাশের কবিরা ভাষাময় করেছেন। ষাটের দশকের নারীরা অগ্নিনীল নিখুঁত, কখনো মুখরা, কবিরা তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হন। ষাটের দশকের হাংরি-স্যাড জেনারেশনের আলোড়িত চৈতন্যে কবিরা কবিতার সাথেই কথা বলেছেন, কখনো গানের ভাষায়, আর সে-ভাষায় সময় হারানোর ভয় ঢুকে গেছে প্রতীচ্যের নেতিবাদী চিন্তার প্রকোপে। কখনো বা এই ভয় ফেটে গিয়ে উদ্গাত হয়েছে চিৎকার, রিরংসা আর মাদকতার নেশা প্রকরণ। তাঁদের কবিতায় গল্প নেই কিন্তু গল্পের সার-সংক্ষেপ আছে, ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা আছে, আছে তরল বিন্যাসও।

সত্তরের দশকের নারীরা কবির আসঙ্গ বাসনার লক্ষ্য নয়, সাথী; কখনো রিরংসার উপাদান, শাড়ির আয়নায় দেখা কখনো তারা বালিকা, প্রত্নবেদীতে মানানসই। কারো নারী কাবিনের — বর্ণনায় তাকে করে তোলা হয় বাৎস্যায়নের কামযুবতী। রূপকল্পের প্রসাধনে সমৃদ্ধ হলেও এই নারী-প্রকরণে ষাটের দশকীয় বোদলেয়ারের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে, তবে তা বিন্যাসে হয়েছে তরলতর। আশির দশকের নারীকে দেখা যায় কম্রমুখী, চিরঘুমদাত্রীরূপে, কলালক্ষ্মীও সে, সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যযোগ্য হল এই নারীরা নারীত্বের নারী, প্যান্ডোরা নারী। কবিরা চিরাচরিত বা নতুন যে ঢঙেই হোক নারীকেই করেন সম্পূর্ণ কবিতার প্রাকরণিক এষণা, ফলে এটি না-বাচাল, না-মূক, ভারসমতার বিন্যাসে পারঙ্গম।

নব্বইয়ের কবিতায় নারী অতি বিচিত্র, বহুস্বরিক। কখনো তারা প্রত্যুষের ঝিকমিক আলো, কখনো স্তনিত-নারী, উপনিষদ থেকে নেমে-আসা, জরায়ু-নারী, কখনোবা আধিপত্যকামী। কবিরা সচেতনভাবে বাকভঙ্গি দিয়ে ব্যক্তিকে উধাও করে শুধু কাব্যশরীরকে মুহূর্তের ন্যানো আঙ্গিকে ধারণ করেন। গল্প নেই, ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা নেই, উপমার বদলে সমাসোক্তির প্রবলতা বেশি। তাঁদের ভাষা প্রাণ-রাসায়নিক, মনোদৈহিক, শারীরবৃত্তীয়, কখনো মনে হয় সাইকির ভাষা, গভীরতর ডিকশন এবং এ মনোভঙ্গিতে নিবিড় যে, হে নারী, কথার গর্ব না-থাকলে পেতাম না তোমাকে। অতএব, ভাষাই এখানে নারীর প্রকরণ।

গ্রন্থপঞ্জি

আফজালুল বাসার (১৯৯১)। বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব, বাংলা একাডেমি ঢাকা।

লী টি লেমন ও মারিওন জে (সম্পাদনা) (১৯৬৫)। *Russian Formalist Criticism : Four Essays.*

ভিক্টর আরলিখ (১৯৮০)। *Russian Formalist : History-Doctorine* হেগ।

ভিক্টর শক্লোভস্কি (১৯৬৬)। 'Art as Technique'. লেমন ও রিস।

টনি বেনেট (১৯৭৯)। *Formalism and Marxism*, লন্ডন।

ফ্রেডরিক জেমসন (১৯৭২)। *The Prison House of Language*, প্রিন্সটন।

ইউরি তিনিয়ানভ (১৯৭৮)। 'On Literary Evolution'. লেডিস্লাভ মাতেজকা ও ক্রিস্টিয়ানা পর্মোসকা (সম্পাদনা), *Reading in Russian Poetics and Structuralist Views*. অ্যান আরবর।

ইউরি তিনিয়ানভ, 'The Meaning of the World in Verse', তদেব।